

## যুগধর্ম ও রামকমল সেন

শমালী ভট্টাচার্য্য 1\*

<sup>1\*</sup> সহকারী অধ্যাপিকা ও বিভাগীয় প্রধান। ইতিহাস বিভাগ, বানোয়ারিলাল ভালোটিয়া কলেজ, আসানসোল।  
Email: shamalibhattacharyay.sb@gmail.com.

### সারসংক্ষেপ:

ইতিহাস জিজ্ঞাসা শিক্ষিত মননের একটি বিশিষ্ট লক্ষণ। ঊনবিংশ শতাব্দীতে ইংরাজী শিক্ষার প্রসার এবং ইউরোপীয় সভ্যতার সঙ্গে যোগাযোগ শিক্ষিত বাঙ্গালীকে যেমন মুগ্ধ ও বিস্মিত করে। অন্যদিকে সাংস্কৃতিক আগ্রাসনের বিরুদ্ধে নিজেদের অস্তিত্ব রক্ষার লড়াইয়ে তারা নিজেদের অতীত অনুসন্ধানে উন্মুখ হয়ে ওঠে। অতীতকে আবিষ্কারের এই আগ্রহ বাঙ্গালীর ইতিহাস চেতনাকে প্রাচীন কুলপঞ্জী, মধ্যযুগীয় জীবনী সাহিত্য ও অষ্টাদশ শতকীয় পুরাণ সাহিত্যের সীমানা থেকে আধুনিক ইউরোপীয় ইতিহাস বোধের দিকে নিয়ে যায়। এই নতুন যাত্রাপথের অন্যতম পথিক ছিলেন রামকমল সেন। যুগসন্ধিক্ষেপে তাঁর চিন্তাবৈশিষ্ট্য, জীবনবোধ, ইতিহাস চেতনা যাবতীয় কর্মকাণ্ড জাতীয় মানসকে কতখানি সমৃদ্ধ করেছে মূলত সেই বিষয়টিকেই বিশ্লেষণাত্মক ভাবে তুলে ধরার প্রচেষ্টা করা হয়েছে বর্তমান নিবন্ধে।

**সূচকশব্দঃ** ভারতবিদ্যাচর্চা, সামাজিক নৃতত্ত্ববিদ্যা, জাতীয়তাবোধ, রাজনৈতিক চেতনা, ইতিহাস সন্ধিৎসা, লোকসংস্কৃতিচর্চা, চিকিৎসাবিদ্যা

বাংলা তথা ভারতের ঊনিশ শতক বুদ্ধিগৌরব দীপ্ত, বৃহত্তর জগতের সান্নিধ্যে গরিয়ান। এই শতকের বাঙ্গালী মনীষা ইউরোপ এর আঠারো শতকের বুদ্ধিবিশ্বাস প্রভাবেই লাভ করেছিল যুক্তিবাদ, বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি, স্বাধীন বিচারবুদ্ধির প্রয়োজনীয়তা। ঊনিশ শতকের প্রারম্ভে এই যুগধর্মে অনুসারী বাঙ্গালী মনীষার অন্যতম প্রতিভূ ছিলেন রামকমল সেন। ঘটনা সাজিয়ে নিছক জীবনী রচনা নয়, যুগসন্ধিক্ষেপে রামকমলের চিন্তা বৈশিষ্ট্য, জীবনধারণা, তত্ত্ব জিজ্ঞাসা, ইতিহাস সন্ধিৎসা, দেশসাধনা বা রাজনৈতিক সচেতনতা, সাহিত্য ও চিন্তাচর্চার পরিচয়ের মধ্য দিয়ে তাঁর ভাবনা সম্পদ জাতীয় মানসকে কাতখানি সচল, সমৃদ্ধ, প্রাণসর, করেছে এবং এশিয়াটিক সোসাইটির আনুকূল্য কিভাবে তাঁর ভাবনা এবং কর্মকাণ্ডকে রূপায়িত করতে সাহায্য করেছে তারই একটা আভাস দেওয়া বর্তমান প্রবন্ধের অভিপ্রায়।

বস্তুত ঊনিশ শতকে পশ্চিম সভ্যতার অভিঘাতে; তত্ত্বচিন্তায় ও রসকল্পনায় ভাবজীবি বাঙালি চরিত্রের যে রূপটি ফুটে ওঠে তার লক্ষণ হচ্ছে জিবনামিমুখীতা ও পরিবেশ সচেতনতা। যুগধর্মের এই লক্ষণ বা বৈশিষ্ট্যগুলি রামকমল সেন এর মধ্যেও মূর্ত হয়ে উঠেছিল- আলোচনা সাপেক্ষে যা ক্রমশই স্পষ্ট হয়ে উঠবে।

১৭৮৪ খ্রিস্টাব্দে এশিয়াটিক সোসাইটির প্রতিষ্ঠা ও এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত পাশ্চাত্য প্রাচ্যতত্ত্ববিদদের হাতে প্রাচীন ভারতীয় সভ্যতা সংস্কৃতির যে পুনরাবিষ্কার ঘটে ( প্রাচ্যতত্ত্ববিদ উইলিয়াম জোস, কোলব্রুক, উইলসন, প্রিন্সেপ এর গবেষণায় প্রমাণিত যে জেমস মিল, চার্লস গ্রান্ট বা মেকলের রচনায় অতীত ভারতের যে

বিষাদময় চিত্র অঙ্কিত হয়েছে তা মোটেই সত্য নয়। বরং ভারতের প্রাচীন যুগ গ্রীসের প্রাচীন যুগের সাথে তুলনীয়, এমনকি সামসাময়িক ইউরোপের সঙ্গেও<sup>1</sup> প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে ভারতীয় নবশিক্ষিতদের মধ্যেও ভারতীয় সভ্যতা সংস্কৃতি সম্পর্কে অনুসন্ধিৎসু দৃষ্টিভঙ্গিকে প্রসারিত করে। যদিও শতাব্দীর দ্বিতীয় দশক পর্যন্ত প্রাচ্যবিদ্যাচর্চা ইউরোপীয়দের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকলেও শতাব্দীর তৃতীয় শতক থেকেই ভারতীয়রা এগিয়ে আসেন। ১৮২৯ এর মার্চ মাসে এশিয়াটিক সোসাইটির শেষ বৈঠকে নেটিভ সদস্য রূপে রামকমল সেন সহ কতিপয় ভারতীয়র অন্তর্ভুক্তি<sup>2</sup> প্রাতিষ্ঠানিকভাবে ভারতবিদ্যাচর্চায় ভারতীয়দের উদ্যোগকে সূচীত করে। সোসাইটির নেটিভ সদস্য ও সম্পাদকরূপে রামকমল সেন ঐতিহ্যময় ভারতের প্রেক্ষাপটে প্রাচ্যবিদ্যাচর্চায় মনোনিবেশ করেছিলেন। যা এক অর্থে ইতিহাস চেতনারই অনুসারী। যদিও ১৮২৯ এ সদস্যরূপে আইনানুগ স্বীকৃতির অনেক আগেই সোসাইটিতে রামকমলের অনুপ্রবেশ ঘটেছিলো। লোকনাথ ঘোষ *Modern History of the Indian Chiefs, Rajas, Zamindars etc*<sup>3</sup> তে জানাচ্ছেন যে ১৮০৬ এ রামকমল প্রথম সোসাইটির সংস্পর্শে আসেন। আবার রামকমলের জীবনীকার প্যারীচাঁদ মিত্রের মতে ১৮১৮-১৯ নাগাদ ১২/- মাইনের করনিকের চাকরি নিয়ে তিনি সোসাইটিতে নিযুক্ত হন।<sup>4</sup> তবে এ বিষয়ে সর্বাধিক উল্লেখযোগ্য ১৮৩২ সালে হেরাস হেম্যান উইলসনকে লেখা রামকমলের একটি পত্র, যেখানে তিনি স্পষ্টতই উল্লেখ করেছেন যে সোসাইটির সঙ্গে তাঁর সংযোগ সেই ১৮০৩-০৪ সাল থেকে<sup>5</sup>। শুধু তাই নয়, প্রদ্যুত কুমার রায় তাঁর *“Ramkamal Sen and the Asiatic society”* তে লিখেছেন<sup>6</sup> জেমস প্রিন্সেপ ২/৩ বছরের জন্য অসুস্থতার কারণে ভারত ছাড়তে চাইলে সোসাইটি তাঁর অনুপস্থিতিতে যৌথভাবে সাধারণ সম্পাদকের দ্বায়িত্বভার রামকমলকে নিতে অনুরোধ জানায়।

মনে রাখা প্রয়োজন, যে সময়কালে সম্পূর্ণ শ্বেতাঙ্গশাসিত সোসাইটির অভ্যন্তরে আইনগত স্বীকৃতিসহ কোনো আভিজাত্যপূর্ণ-বংশমর্যাদাহীন ভারতীয়র প্রবেশাধিকার ছিল সম্পূর্ণ অভাবনীয়। এ বিষয়ে Ronaldshay যথার্থই বলেছেন যে,<sup>7</sup> চারিত্রিক দৃঢ়তা ও নৈতিকতাই তাঁকে সামান্য করনিক থেকে council সদস্যে উপনিত করেছে।

রাজেন্দ্রলাল মিত্র তাঁর “Centenary Review” তে লিখেছেন,<sup>8</sup> রামকমল সেন সোসাইটির সংগ্রহশালা সমৃদ্ধির জন্য বিশেষ উদ্যোগী হয়েছিলেন। কিছুদিন তিনি মিউজিয়াম এর Assistant superintendant ও ছিলেন। স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের মতে, রামকমল দেশের নানা স্থান থেকে সেইসব জিনিস সংগ্রহ করে সোসাইটির মিউজিয়ামকে মনোগ্রাহী করে তোলেন যেগুলি সাধারণত লোকচক্ষুর আড়ালেই থেকে যায়।<sup>9</sup> সোসাইটির সংগ্রহশালায় তাঁর প্রদত্ত জিনিসগুলি হলঃ

- ক) চড়ক উৎসবে ব্যবহৃত সরঞ্জামসমূহ
- খ) বৈরাগী সম্প্রদায়ের ব্যবহৃত উপাদানসমূহ
- গ) সঙ্গীতে ব্যবহৃত বাদ্যযন্ত্র সমূহ
- ঘ) একটি শুকনো মাছ
- ঙ) ওড়িয়া রমণীদের ব্যবহৃত অলংকারসমূহ
- চ) তিনটি ছোট বুদ্ধ মূর্তি

১৮২৯ সালে চড়ক পূজা সঙ্কান্ত একটি প্রবন্ধও তিনি সোসাইটিতে পাঠ করেন।<sup>10</sup>

সোসাইটির কর্মকাণ্ডে তিনি অঙ্গঙ্গীভাবে যুক্ত হওয়া সত্ত্বেও যুগধার্মিক হিসেবে রামকামলকে দেখতে গিয়ে এক নতুন রূপ তাঁর দেখা গেল উপরিউক্ত কর্মকাণ্ডে। আজ যে সামাজিক নৃতত্ত্ববিদ্যা বহুল চর্চিত, আজ থেকে প্রায় ২০০ বছর আগে রামকমল সেন এহেন বিদ্যাচর্চাই যথেষ্ট আগ্রহ ও দক্ষতা দেখিয়েছিলেন। বলা বাহুল্য উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে এ জাতীয় মানসিকতা ছিল সময়ের তুলনায় অনেকটাই অগ্রবর্তী এবং বিরল।

আসলে ইতিহাস চর্চায় লোকসংস্কৃতির গুরুত্ব যে অপরিসীম তা আজ বলার অপেক্ষা রাখে না। ইতিহাস চর্চায় এই গুরুত্বের সূক্ষ্ম উপলব্ধিও রামকমলের মধ্যে লক্ষণীয়। যেহেতু সামগ্রিক বিচারে লোকসংস্কৃতি বলতে জনমানসের ঐতিহ্য, সামাজিক রীতিনীতি ও বিশ্বাসের স্বতোৎসারিত অভিব্যক্তি বোঝায়, সেহেতু তা ক্ষেত্রবিশেষে মৌখিক সাহিত্য, শিল্প, সঙ্গীত, নৃত্য, অভিনয়, আচার আচরণ, ধর্মক্রিয়া, বিশ্বাস, সংস্কার, পালাপার্বণ, উৎসব অনুষ্ঠান প্রভৃতিতে রূপ লাভ করে। লোকসংস্কৃতি চর্চার এই মানদণ্ডে বিচার করলে রামকমল সেনের চড়ক উৎসবে ব্যবহৃত সরঞ্জামসমূহ, ওড়িয়া রমণীদের ব্যবহৃত অলংকারসমূহ সংগ্রহ প্রসূত কর্মকাণ্ড লোকসংস্কৃতিচর্চা বা লোক ইতিহাস অনুসন্ধানেরই প্রয়াস রূপে বিবেচিত হতে পারে। ইতিহাস ও লোকসংস্কৃতির এই মেলবন্ধনের কথা স্বয়ং রবীন্দ্রনাথের কণ্ঠেও উচ্চারিত হয়েছে- ‘বড়ই দুঃখের বিষয় যে, আমরা দেশে থাকিয়াও দেশের বিষয়ে কিছুই জানিনা। আমাদের দেশের বাহ্য জাগতের সহিত আমাদের কোন যোগ নাই... বস্তুত আমাদের এইরূপ অজ্ঞতা স্বদেশের প্রতি আমাদের অনুরাগকে বড়ই সঙ্কীর্ণ করিয়া ফেলে’<sup>11</sup>

‘জগতের সেই আদি নিকেতনে যদি জড়ত্ব ত্যাগ করিয়া প্রবেশ করি; তাহা হইলে আমাদের ঔৎসুক্যর সীমা থাকিবে না... সন্ধান ও সংগ্রহ করিবার বিষয় এমন কত আছে তাহার সীমা নাই.. গ্রাম্য ছড়া, ছেলে ভুলাইবার ছড়া, প্রচলিত গান প্রভৃতির মধ্যে অনেক জ্ঞাতব্য বিষয় নিহিত আছে’<sup>12</sup>. ইতিহাসে লোকসংস্কৃতির গুরুত্ব বিষয়ে রবীন্দ্রনাথের এই মনোভঙ্গীর প্রায় আট দশক পূর্বেই ইতিহাসে লোকসংস্কৃতির তাৎপর্য অনুধাবনে রামকমলের দৃষ্টিভঙ্গি যেন আশ্চর্যজনক ভাবে উত্তর আধুনিক বলেই মনে হয়।

সাধারণভাবে রাষ্ট্রবিজ্ঞানের দৃষ্টিকোন থেকে বলা যায় যে, জাতীয়তাবোধের সঙ্গে রাজনৈতিক উদ্দেশ্য সম্পৃক্ত থাকলে তাকে জাতীয়তাবাদ বলে। জাতীয়তাবাদের এই সংজ্ঞার আলোকে রামকমলকেও জাতীয় মননের প্রতীক হিসেবে চিহ্নিত করা যায় কেননা জাতীয়তাবোধের পূর্বশর্তই হল রাজনৈতিক সচেতনতা। নির্দিষ্ট রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে ১৮৩৭ এর ১২ই নভেম্বর হিন্দু কলেজে এক সভার মধ্য দিয়ে কলকাতার বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের প্রচেষ্টায় প্রতিষ্ঠিত হয় ‘জমিদার সভা’। ১৮৩৮ এ এই সভা Land Holder Society নামে পরিচিত হয়। যার মূল প্রস্তাবকই ছিলেন রামকমল সেন। সদস্যরা হলেন রাখাকান্ত দেব, প্রসন্নকুমার ঠাকুর ও ভবানীচরন মিত্র। কমিটি গঠিত হয়েছিল নির্বাচনের ভিত্তিতে। সমিতি গঠনের বহু পূর্ব থেকেই রাজনৈতিক ভাবে যে আলাপ আলোচনা চলেছিল তার প্রমান পাওয়া যায় সমাচার দর্পণের পাতায়<sup>13</sup>- “কথিত আছে যে দেওয়ান শ্রীযুত রামকমল সেন এক নতুন সমাজ গঠন করিতে নিশ্চয় করিয়াছেন। তাঁহার অভিপ্রায় যে নিষ্কর ভূমধ্যাকারীদের পক্ষে এবং রাজকীয় কর্মে বঙ্গভাষা চলন হওয়া বিষয়ে এক আবেদনপত্র ইংলন্ড দেশে প্রেরন করেন”। এক্ষেত্রে তিনটি বিষয় লক্ষণীয়ঃ সমিতির মাধ্যমে রাজনৈতিকভাবে শ্রেণীস্বার্থ রক্ষায় ( জমিদার

শ্রেণী) উনিশ শতকের তথাকথিত রক্ষণশীল ব্যক্তিত্ব একই ছত্রতলে সমবেত হয়েছিলেন। দ্বিতীয়ত, নির্বাচনের ভিত্তিতে কমিটি গঠন করে সমিতির গনতান্ত্রিক ভাবধারার সূচনা ঘটিয়েছিল। তৃতীয়ত, রাজকীয় কর্মে বঙ্গভাষা চলন হওয়া বিষয়ে জমিদার সভার সঞ্চালক হিসেবে রামকমল যে আবেদনপত্র ইংলন্ডে পাঠানো মনস্থ করেন তাতে শ্রেণীস্বার্থ ছড়াও বৃহত্তর ভাবনা সম্পৃক্ত ছিল। এই ঘোষণায় একদিকে যেমন তাঁর মাতৃভাষার প্রতি অনুরাগ ও মনোযোগ প্রকাশ পেয়েছে অন্যদিকে তেমনি সাধারণ মানুষের প্রয়োজনের স্বার্থে প্রশাসনিক কাজে বঙ্গভাষা ব্যবহারের দাবীও তুলে ধরেছেন। কাজেই দেশ ও জাতির আত্মপ্রতিষ্ঠার বীজও এই সমিতির ভিত্তিমূলে প্রথিত ছিল। পরবর্তী তিন দশকে ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে আঞ্চলিক স্তরে অসংখ্য রাজনৈতিক সমিতি গড়ে ওঠার মধ্যদিয়ে যে রাজনৈতিক ধ্যানধারণা ও জাতীয়তাবোধ পুষ্ট হয়েছিল তারই অনিবার্য ফলশ্রুতি ছিল সর্বভারতীয় রাজনৈতিক সংগঠন জাতীয় কংগ্রেস (১৮৮৫) প্রতিষ্ঠা। সুতরাং একথা বলাই যায় যে, জাতীয়তার ভিত্তিতে রাজনৈতিক সংগঠন গড়ে ওঠার দূর অথচ নিশ্চিত পূর্বসূরি ছিল জমিদার সভা। এই সভার প্রতিষ্ঠাতা হিসেবে রামকমল অবশ্যই ঐতিহাসিক ভূমিকা পালন করেছিলেন। রাজেন্দ্রলাল সঙ্গতভাবেই বলেছেন- এই সমিতি ছিল এদেশের স্বাধীনতা আন্দোলনের পুরোধা।<sup>14</sup>

উনিশ শতকে পাশ্চাত্য প্রভাবে বাঙ্গালী জীবনের প্রায় সামগ্রিক ক্ষেত্রে পরিবর্তনের ধারা প্রবহমান ছিল। রাজা, রাজভাষা, বৃত্তি পরিবর্তনের পাশাপাশি চিন্তা চেতনা, দৃষ্টিভঙ্গিও পরিবর্তিত হয়ে বাংলাদেশ এক নতুন যুগের দ্বারে উপস্থিত হয়। এই নবযুগের পীঠস্থান ছিল কোলকাতা। পরিবর্তিত এই পরিবেশে ১৮০০ খ্রিষ্টাব্দে স্বগ্রাম গরিফা থেকে জীবনসাধনায় কলকাতায় এসেছিলেন রামকমল সেন। তাঁর বর্ণনাময় কর্মবহুল জীবনের সূত্রপাত ঘটেছিল ১৮০৪এ হিন্দুস্থানী প্রেসের কম্পোজিটার হিসেবে। পরে ১৮২৮এ টাঁকশালে নেটিভ সেক্রেটারী হিসেবে এবং ১৮৩২এ বেঙ্গল ব্যাংকের দেওয়ান হিসেবে নিয়োগপত্র লাভ করেন,<sup>15</sup> এবং আমৃত্যু এই পদাভিষিক্ত থাকেন। প্রতিষ্ঠাকাল থেকেই তিনি হিন্দু কলেজ ও ‘স্কুল বুক সোসাইটি’র সাথে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত ছিলেন। যুক্ত ছিলেন “এগ্রিকালচার ও হার্টিকালচার সোসাইটি”র সঙ্গেও। কৃষিপ্রধান ভারতে কৃষি ও শিল্পের বিকাশই জাতীয় অর্থনীতিকে সমৃদ্ধ করবে- এই সত্য অনুধাবন করেছিলেন তিনি। প্রায় ১৩০ বছর পর যার প্রতিফলন ঘটে প্রথম ও পরবর্তী পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনাগুলিতে। সোসাইটির ‘ট্র্যাঞ্জাকশান’-এ ‘কাগজ-শিল্প’ সংক্রান্ত তাঁর লিখিত একটি সুচিন্তিত প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। ভারতীয় উদ্ভিদ-গবেষণায় তিনি ছিলেন অত্যন্ত আগ্রহী। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, তিনি মেডিকেল কলেজে উদ্ভিদবিদ্যায় সর্বোৎকৃষ্ট ছাত্রকে নিজব্যয়ে পরপর তিন বছর একটি স্বর্ণপদক দানের ব্যবস্থা করেন। পেশাগতভাবে চিকিৎসক না হয়েও আধুনিক বিজ্ঞানসম্মত চিকিৎসাবিদ্যা প্রসারে তাঁর বিবিধ কার্যক্রম লক্ষণীয়। প্রথমেই যেটি উল্লেখ্য, সেটি ইংরেজি গ্রন্থ অবলম্বনে ১৮১৯সালে “ঔষধসারসংগ্রহ” বাংলাভাষায় প্রকাশ করে তিনি আধুনিক পাশ্চাত্য চিকিৎসাবিজ্ঞানকে বঙ্গসমাজের একেবারে অভ্যন্তরে ছড়িয়ে দিতে চেয়েছিলেন। পুস্তকখানির ভূমিকাতে তিনি লেখেন- “ইদানীং ইংরেজের রাজ্যোন্নতি হইবাত্তে ইউরোপীয় চিকিৎসকের ব্যবসা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি ও ব্যাপক হইতেছে আর হিন্দুর বৈদ্যকশাস্ত্রের অনুশীলনার অপ্রাচুর্যপ্রযুক্ত এতদেশীয় অনেক বিশিষ্ট লোক ইংরাজী ঔষধ ব্যবহার করিতেছেন। বৈদ্যক গ্রন্থ এ পর্যন্ত এ দেশের ভাষায় হয় নাই। এ কারণ তত্তদৌষধের তত্ত্বজ্ঞ ইহারাই হইতে পারেন না, অতএব যে সকল ভেষজ সতত ব্যবহার্য, তাহার নাম, উৎপত্তি, গুণ অধিকার বাঙ্গলা ভাষায় সর্বসাধারণের নিমিত্তে প্রকাশ করিলাম। যদি এ প্রস্তুত গ্রন্থগ্রাহ্যোপযুক্ত হয়, তার উপকার আইসে তবে যে

যে ঔষধ লিখা যায় নাই তাহা সম্বলিত ও অর্থক্রটি হইয়া থাকে তাহা শোধানপূর্বক পুনর্বীর বাহুল্যরূপে ছাপা হইবেক। সন ১২১৬, শ্রী রামকমল সেন।“ এ বিষয়ে ‘সমাচার-দর্পণ’ এ ৫ই জুন ১৮১৯এ একটি সংবাদ প্রকাশিত হয়। ..... “শ্রীযুক্ত বাবু রামকমল সেন হিন্দুস্থানী ছাপাখানাতে এক নতুন পুস্তক ছাপাইয়াছেন, তাহার নাম “ঔষধসারসংগ্রহ” অথবা সচরাচর ব্যবহৃত ঔষধ নির্মাণ। এ পুস্তক অতি উপকারক এবং ওই পুস্তকের মধ্যে ছাপান্ন রকমের ঔষধের বিবরণ ও তাহা খাইবার ক্রমসকল লিখিত আছে এবং কোন পীড়ায় কোন ঔষধ সেবন করা উপযুক্ত তাহাও লিখিত আছে। ইউরোপীয় বৈদ্যকশাস্ত্র বাঙ্গালা ভাষায় কেউ তর্জমা করে নাই। এখন এই এক পুস্তক প্রকাশ হওয়াতে আমাদের ভরসা হইয়াছে যে ক্রমে তাবৎ ইউরোপীয় বৈদ্যকশাস্ত্র বাঙ্গালা ভাষায় প্রকাশ হইতে পারিবে এবং যদি এই ভরসা সফল হয় তবে এতদেশীয় লোকদের যথেষ্ট উপকার হইবে।<sup>16</sup>

সুতরাং সমসাময়িক অবস্থায় একজন হিসাববিশেষজ্ঞের পক্ষে এহেন কার্যকারিতা যথার্থই বিজ্ঞানমনস্কতা ও সেইসাথে দেশহিতের লক্ষণ- সন্দেহ নেই। মেডিকেল কলেজ প্রতিষ্ঠার সঙ্গেও তিনি অঙ্গঙ্গিভাবে যুক্ত ছিলেন। বিশেষত ১৮৩৪-এ বড়লাট লর্ড উইলিয়ম বেন্টিনক চিকিৎসাবিদ্যাশিক্ষার তৎকালীন ব্যবস্থাবিশ্লেষণ এবং এর উন্নতিকল্পে সুপারিশের জন্য পাঁচসদস্যবিশিষ্ট একটি কমিটি গঠন করেন- যার মধ্যে একমাত্র ভারতীয় সদস্য ছিলেন রামকমল সেন।

ঔষধ-সারসংগ্রহ ছাড়াও তিনি ‘নীতিকথা’ ও ‘হিতোপদেশ’ রচনা করেন। ১৩১ টি ফরাসী গল্পের অনুবাদ সম্বলিত হয় ‘নীতিকথা’-য় আর ‘হিতোপদেশ’ রচিত হয় শ্রীরামপুর পাঠশালার উদ্দেশ্যে। কিন্তু এই বিষয়ে তাঁর সর্বাধিক কৃতিত্ব ১৮৮৪ সালে জনসনের বিখ্যাত ইংরাজি অভিধান (টেডের সংস্করণ) অবলম্বনে “ইংরাজী-বাংলা অভিধান” (প্রথম ও দ্বিতীয়) প্রকাশ। প্রথম খণ্ডের পৃষ্ঠা সংখ্যা ৫৪২, দ্বিতীয় খণ্ডের ৫৬০। ১৮১৭ তে তিনি এর সম্বলন শুরু করেন। ১৮২৫ এর ১৮ই জুন তিনি সমাচার দর্পণ এ লিখছেন- “ডিকশিয়নারি প্রস্তুত করা অপেক্ষা সহিষ্ণুতার কর্ম আর নাই। পৃথিবীর মধ্যে নানা লোকের নান বিষয়ে পরম সুখ বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। কেহ কেহ এক মুদ্রার উপর অন্য মুদ্রা রাখিয়া রাশি করিয়া পরম সুখ জ্ঞান করেন, কেহ বা আপন জ্যেষ্ঠ সন্তানের প্রথম বাক্যতে আপন সুখ জ্ঞান করেন, কেহ বা বৃক্ষমূলে বসিয়া পরম সুখ জ্ঞান করেন, কেহ বা সমুদ্রতীরে তরঙ্গ দেখিতে পরম আপ্যায়িত হন, কিন্তু ইহার কোন সুখই ডিকশিয়নারি করার তুল্য নহে।”

“..... কিন্তু রহস্য ছাড়িয়া যথার্থ কহিতে হইলে ডিকশিয়নারি প্রস্তুত করার তুল্য পরিশ্রম পৃথিবীর মধ্যে আর কোন কর্মে নাই। ডিকশিয়নারির কর্তারা বিদ্যার মজুর, তাহারা মাল-মশালা প্রস্তুত করিয়া দেন, অন্যরা ঘর গাঁথে। যদি আমাদের কোন শত্রু থাকিত এবং তাহাকে কোন দণ্ড দেওয়া কর্তব্য হইত তবে আমরা তাহাকে পনেরো বৎসর পর্যন্ত কেবল ডিকশিয়নারি প্রস্তুত করিতে নিযুক্ত করিতাম। কিন্তু অন্যপক্ষে দৃষ্টি করিলে এইরূপ ডিকশিয়নারি করাতে যত পরিশ্রম ততোধিক সন্মম। উত্তম কোষকর্তারা সত্য অমর হন। যতকাল পর্যন্ত ভাষা থাকে, ততকাল পর্যন্ত তাঁহারা স্মরণীয় থাকেন”- সম্পাদকের এ মন্তব্যের যে বিকল্প নেই তা অনস্বীকার্য। আসলে এক্ষেত্রেও রামকমলের সেই জনহিতবাদী দৃষ্টিভঙ্গিরই প্রতিফলন দেখা যায়। ইংরাজি-বাংলা অভিধানের ভূমিকায় তিনি লিখছেন (পৃষ্ঠা ১৮) “About this time I studied English at a

school kept by a Hindu up the river, where the boys used to wake extracts from the 'Toote Namha' and 'Arabian Tales' which were used as class-books, there being no Dictionary or Grammar. Mr. Froster had needed published a vocabulary, but the price was so high as to be beyond the reach of the generality of the public." সুতরাং তাঁর এ জাতীয় উদ্যোগ যে বৃহত্তর সমাজমনস্কতারই অনুসারী এ বিষয়ে সন্দেহ নেই।

ঊনবিংশ শতাব্দীতে পাশ্চাত্য অভিঘাতে সর্বাপেক্ষা বেশি আক্রান্ত হয়েছিল “ধর্ম” ও “সমাজ”। সমাজ ও ধর্মের সংস্কার হিসেবে এ সময়ে ত্রিধারার উপস্থিতি লক্ষণীয়। ১) রামমোহনপন্থীরা পাশ্চাত্য যুক্তিবাদী শিক্ষা ও একেশ্বরবাদের মধ্যে খুঁজে পেয়েছিলেন নতুন যুগের দিশা; ২) ডিরোজিয়ানদের উদ্দেশ্য ছিল প্রাচ্যের যাবতীয়কে বর্জনের মাধ্যমে সমাজ ও ধর্মের সংস্কার; আর ৩) অপর এক শ্রেণী তাঁরা প্রাচীন ঐতিহ্যের হাত ধরেই নতুন যুগকে আঙ্গান জানাতে চেয়েছিলেন। এই শেষোক্ত ধারারই প্রতিনিধি ছিলেন রামকমল সেন।

১৮২৩ এর ১৬ই ফেব্রুয়ারি গৌড়ীয় সমাজ স্থাপিত হয় যার মুখ্য সদস্য ছিলেন রামকমল সেন। প্রভাত কুমার মুখোপাধ্যায় “রামমোহন ও তৎকালীন সমাজ ও সাহিত্য”<sup>17</sup> তে লিখছেন- “রামমোহনের বিপ্লবী ধর্মীয় ও সামাজিক মত প্রতিহত করার জন্য বর্ণহিন্দুরা গৌড়ীয় সমাজ গঠন করেছিল।” আত্মীয় সভা ছিল বিশেষভাবে ধর্মালোচনার সভা। কিন্তু গৌড়ীয় সমাজের কর্মসূচী ছিল ব্যাপকতর। এর লক্ষ্য ছিল মূলতঃ জ্ঞানের উন্নতি ও প্রসার, বাংলা ভাষায় গ্রন্থাদির প্রচার, নীতি ও শাস্ত্রবিগর্হিত কার্যদমন, গ্রন্থাগার গঠন ও বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতি সংগ্রহ।<sup>18</sup> যদি এর অস্তিত্ব ছিল দুবছর তবে ১৮৩০ এ প্রতিষ্ঠিত ‘ধর্মসভা’-র মূল নিহিত ছিল এর অন্তরেই। “সতী আইন” রদের উদ্দেশ্যে বেস্টিংক হিন্দু নাগরিকদের আবেদন প্রত্যাখ্যান করলে বিলাতে আপিলের যে পরিকল্পনা হয়, তার ব্যবস্থাদির ভার পড়ে ধর্মসভার উপর। কিন্তু সে আপিলও অগ্রাহ্য হলে ধর্মসভায় ভাঙন ধরে। রামকমল এই সভার সদস্য হওয়া সত্ত্বেও যে এই প্রথাকে মানেননি তা তাঁর একটি উদ্ধৃতি থেকে স্পষ্ট হয়ে ওঠে। সভাতে কেউ কেউ প্রস্তাব করেছিলেন সতীদাহ নিবারণে হেস্টিংসের হস্তক্ষেপ না করার জন্য প্রশংসা করে বাক্য সন্নিবেশিত হোক। কিন্তু রামকমল সেন বলেন- “এই প্রক্রিয়া আমাদের দেশের নিন্দনীয় অতএব সেকথা এখানে বিন্যাস করা কর্তব্য নহে।”<sup>19</sup> অর্থাৎ দেশজ ঐতিহ্যকে ধরে রাখার তাঁদের যে প্রয়াস তারই মধ্য থেকে সতীদাহ প্রথাকে ‘নিন্দনীয়’ আখ্যায়িত করার যে দৃষ্টিভঙ্গি তা থেকে মনে হয় হিন্দুত্বের গোঁড়ামি তার মধ্যে ছিল না, যা ছিল তা হল দেশজ ঐতিহ্যের সঙ্গে আধুনিকতার মেলবন্ধনের প্রয়াস। আসলে রাজশাসন ও সমাজশাসনকে রামকমল দুটি পৃথক স্তম্ভ হিসেবে দেখেছিলেন। সমাজ নেতা রাধাকান্তদেবের মতই রামকমল আমাদের সমাজশাসনে বিদেশীদের হস্তক্ষেপের বিরোধী ছিলেন। পরিবর্তনের প্রয়োজন হলে সমাজের মধ্যে থেকেই তার ভাগিদ আসবে এবং যথাযোগ্য ব্যবস্থা গৃহীত হবে, ধর্ম ও সমাজ বিষয়ে এই অভিপ্রায়ই রামকমলের মধ্যে লক্ষণীয়। দিলীপ কুমার বিশ্বাস ‘রামমোহন সমীক্ষা’<sup>20</sup> ১৮২৯ এর ৪ঠা নভেম্বর বেস্টিংকের লিখিত সতীদাহসংক্রান্ত প্রতিবেদন উদ্ধৃত করে দেখিয়েছেন যে, সতীদাহ নিবারণে রামমোহন বেস্টিংককে যে পরামর্শ দিয়েছিলেন, তাতে তিনি সরাসরি আইন প্রণয়নের স্থলে প্রচলিত নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা ও পুলিশি হস্তক্ষেপ ক্রমশঃ আরো জোরদার করে সতীদাহ বন্ধ করার পরামর্শ দেন। সুতরাং সমাজশাসনে বিদেশী শাসকের আইনের ভূমিকা সম্পর্কে রামমোহনও দ্বিধাশ্রিত ছিলেন। অথচ উনিশ শতকের সামগ্রিক

ভাবসংঘাতের প্রেক্ষাপটে ধর্মসমাজ প্রক্ষেপে পরিবর্তনকামী ব্যক্তিত্বকে 'প্রগতিশীল' ও তার বিরুদ্ধাচরণকারী ব্যক্তিত্বকে 'রক্ষণশীল' বলে চিহ্নিত করার ধারা আজও বহমান। উনিশ শতকের সামাজিক পরিবেশের মানদণ্ডে ধর্ম-সমাজ সম্পর্কে এই ব্যক্তিনিরপেক্ষ সূক্ষ্ম-অনুভূতি গুরুত্বহীন।

আসলে রামকমলের কর্মকাণ্ডকে বিশ্লেষণ করতে হবে উনিশ শতকের প্রেক্ষাপটে পরিবেশ পরিস্থিতির মানদণ্ডে। কোন ব্যক্তিত্বই যুগোত্তীর্ণ নন। কিন্তু উনবিংশ শতাব্দীর শুরুতেই রামকমল সেন সাংস্কৃতিক ও বৌদ্ধিক জগতে যে আলোড়নের সূত্রপাত ঘটিয়েছিলেন তা তাঁকে যুগধর্মের পথিকৃৎ বলেই বিবেচিত করে।

### তথ্যসূত্রঃ

1. রাখাল চন্দ্র নাথ, *মননের আলোকে বাঙ্গালী*, অপর্ণা বুক ডিস্ট্রিবিউটার্স, কলকাতাঃ ২০০০, পৃ. ৩২।
2. ব্রজেননাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, *সমাচার-দর্পণ*, ৯ই চৈত্র ১২৩৫ বঙ্গাব্দ।
3. Lokhnath Ghose; *Modern History of the Indian Chiefs, Rajas, Zamindars etc, P-II*; J.N. Ghose & Co.; Calcutta: 1881, pp-129.
4. Peary Chand Mitra; *Life of Dewan Ramkamal Sen*; Calcutta: 1880, p-7.
5. Progs. A.S.B. Vol-IV, pp- 144.
6. J.A.S.B- XXVII, 1985 No-III, pp- 95.
7. Ronaldshay; *The Heart of Aryabhatṭa*, 1925, pp-48
8. *Centenary Review of the Asiatic Society, History of the society, P-I*; Calcutta:1885, pp-35.
9. Progs. A.S.B. Vol.-IV, page-144. Meeting dated 12<sup>th</sup> Dec. 1932.
10. I.A.S.B. Vol.-II Jan-Dec. 1833, pp- 609-613
11. ছাত্রসভায় রবীন্দ্রনাথের অভিভাষণ- ভাদ্র ১৩১৬, *বঙ্গদর্শন*, নবপর্ষায়, নবম বর্ষ, পট্ট-১৩১৬, পৃঃ ৪২৯-৪৩১।
12. ছাত্রদের প্রতি সম্বাষণ - বৈশাখ ১৩১২, *রবীন্দ্র রচনাবলী*, জন্মশতবার্ষিকী সংস্করণ, খণ্ড ১৩, পৃঃ ৭২৯।
13. *সমাচার দর্পণ*, ১৪ই অক্টোবর ১৮৩৭।
14. ভারতীয় জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের পটভূমি, নিখিল যুব, জুলাই- ১৮৮৯, প.ব.রা.পু. পর্ষদ, পৃঃ ৭৭।
15. *সমাচার দর্পণ*-, ১ ডিসেম্বর, ১৮৩২।
16. শ্রী ব্রজেননাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, *সংবাদপত্রের সেকালের কথা*, সাহিত্য পরিষদ গ্রন্থাবলি-৮-২, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ মন্দির, কলকাতাঃ ১৯৩১, পৃঃ ৬০।
17. প্রভাত কুমার মুখোপাধ্যায়, *রামমোহন ও তৎকালীন সমাজ-সাহিত্য*, কলকাতাঃ ১৯৭২, পৃঃ ৩০৮।
18. কীর্তির্ষস্য, ভবতোষ দত্ত, পৃঃ ১৩।
19. শ্রী ব্রজেননাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, *সংবাদপত্রের সেকালের কথা Vol-I*, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ মন্দির, কলকাতা; পৃঃ ২৩৩-১৩৪।
20. দিলীপ কুমার বিশ্বাস, *রামমোহন-সমীক্ষা*, সারস্বত লাইব্রেরী, কলকাতাঃ ১৯৬৬, পৃঃ ৩৪৪।